সমাজতন্ত্র

কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক

(৫ মে ছিলো মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ১২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে তাঁর রচনা, সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক থেকে নির্বাচিত অংশ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তুলে ধরা হলো।)

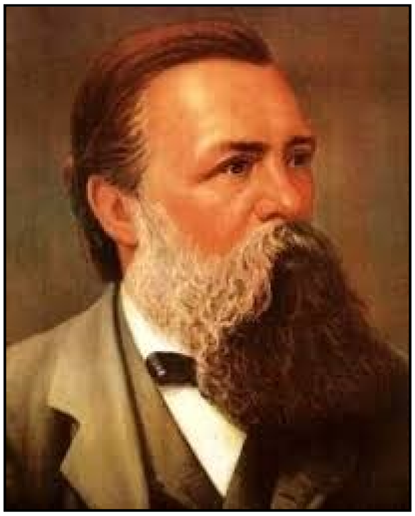

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ঐতিহাসিক আবির্ভাবকাল থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি তথা বিভিন্ন সম্প্রদায় সমস্ত উৎপাদন উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের স্বপ্ন দেখে এসেছেন ন্যূনাধিক অস্পষ্টভাবে ভবিষ্যতের আদর্শ হিসাবে। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারে, ঐতিহাসিক রূপে আবশ্যিক হয়ে উঠতে পারে শুধু তখনই যখন তার বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ অবস্থা বিদ্যমান। অপরাপর প্রতিটি সামাজিক প্রগতির মতোই তা সম্ভবপর হয় এই জন্য নয় যে, লোকে বুঝতে পারছে, শ্রেণির অস্তিত্ব ন্যায়, সমানাধিকার ইত্যাদির পরিপন্থী, এ শ্রেণি-বিলোপের ইচ্ছা দ্বারাই কেবল নয়, সম্ভবপর হয় কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে। শোষক ও শোষিত শ্রেণি, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণিতে সমাজের বিভাগ ছিল পূর্বতন কালের উৎপাদনের অপরিণত সীমাবদ্ধ বিকাশের অপরিহার্য পরিণাম। সকলের অস্তিত্বের জন্য কোনো ক্রমে যেটুকু দরকার তার চেয়ে কেবল অতি অল্প পরিমাণ উদ্বৃত্ত যতদিন উৎপন্ন হচ্ছে সমগ্র সামাজিক মেহনত দ্বারা, সেই হেতু সমাজ-সদস্যদের বিপুল অধিকাংশের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সময় যতদিন খেয়ে যাচ্ছে মেহনতের পিছনে, ততদিন অনিবার্যভাবেই এ সমাজ বিভক্ত থাকছে শ্রেণিতে। পুরোপুরি মেহনতের যারা বাঁধা গোলাম, সেই বিপুল অধিকাংশের পাশাপাশি উদিত হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শ্রম থেকে মুক্ত একটা শ্রেণি, যারা সমাজের সাধারণ বিষয়গুলির দেখাশোনা করে, যেমন শ্রম পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কাজ, আইন, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি। সুতরাং শ্রম-বিভাগের নিয়মটাই আছে শ্রেণি-বিভাগের মূলে। কিন্তু তাতে করে বলাৎকার ও লুণ্ঠন, প্রতারণাপূর্বক ও জুয়াচুরি দ্বারা এই শ্রেণি-বিভাগ সম্পাদন আটকায় না। শাসকশ্রেণি একবার আধিপত্য পাবার পর শ্রমিক শ্রেণির বিনিময়ে তার ক্ষমতা সংহত করা, সামাজিক নেতৃত্বটাকে জনগণের তীব্রতর শোষণে পরিণত করা, এ সব তার আটকায় না।

কিন্তু এ স্বীকৃতি অনুসারে শ্রেণি-বিভাগের যদি একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ন্যায্যতা থেকে থাকে, তবে তা শুধু একটা বিশেষ যুগের জন্য, কেবল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির আমলে। তার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের অপ্রতুলতা। আধুনিক উৎপাদন শক্তির পূর্ণ বিকাশের ফলে তা ভেসে যাবে। এবং বস্তুত, সমাজের শ্রেণি বিলোপে ঐতিহাসিক বিকাশের এমন একটা মাত্রা ধরে নেওয়া হয় যেখানে অমুক অমুক বিশেষ শাসক শ্রেণি কেবল নয়, কোন রকম শাসক শ্রেণিরই এবং সেই হেতু, শ্রেণি-ভেদের অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে এক অপ্রচলিত কাল-ব্যতিক্রম। সুতরাং তা ধরে নেয় উৎপাদনের এমন একটা পর্যায়ে বিকাশ, যেখানে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণি কর্তৃক উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দখল এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক আধিপত্য, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকার শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে তাই নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিকাশের প্রতিবন্ধক।

এ সীমায় এখন আমরা পৌঁছেছি। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা স্বয়ং বুর্জোয়াদের কাছেও আর গোপন নয়। তাদের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার আবির্ভাব ঘটেছে নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর। প্রতিটি সংকটেই সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছে তারই উৎপাদন শক্তি ও উৎপন্নের চাপে–তাকে সে আর ব্যবহার করতে পারছে না, অসহায়ের মতো সে এই অদ্ভুত স্ববিরোধের সম্মুখীন যে, উৎপাদকদের ভোগ্য কিছুই নেই কেননা খরিদ্দার নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি যে নিগড় চাপিয়েছিল তা ফেটে বেরুচ্ছে উৎপাদন উপায়ের সম্প্রসারণী শক্তি। উৎপাদনশক্তির অবিচ্ছিন্ন নিয়ত ত্বরান্বিত বিকাশ এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের প্রায় সীমাহীন বৃদ্ধির একমাত্র পূর্বশর্ত হলো এই সব নিগড় থেকে উৎপাদন উপায়ের মুক্তি। শুধু তাই নয়, উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের ফলে শুধু যে উৎপাদনের বর্তমান কৃত্রিম বাধাগুলি দূর হয়ে যায় তাই নয়, দূর হয় উৎপাদন শক্তি ও উৎপন্নের সেই প্রত্যক্ষ অপচয় ও সর্বনাশ, যা বর্তমানে উৎপাদনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এবং সংকটকালে যা সর্বোচ্চে ওঠে। অধিকন্তু আজকের শাসক শ্রেণি ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতাচারের অবসান করে তা উৎপাদন উপায় ও উৎপন্নের একটা বড় অংশকে উন্মুক্ত করে দেয় সাধারণ সমাজের জন্য। সমাজীকৃত উৎপাদন দ্বারা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য বৈষয়িকভাবে পর্যাপ্ত এবং দিন দিন পরিপূর্ণতর একটা অস্তিত্বই শুধু নয় সকলের কায়িক ও মানসিক বৃত্তির অবাধ বিকাশ ও প্রয়োগের নিশ্চিতি দেওয়া একটা অস্তিত্ব অর্জনের যে সম্ভাবনা, সে সম্ভাবনা এই প্রথম এলেও এসে গেছে।

সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের উপায় দখলের পর অবসান হয় পণ্য উৎপাদনের এবং যুগপৎ উৎপাদকের ওপর উৎপন্নের আধিপত্যের। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বদলে আসে ধারাবাহিক নির্দিষ্ট সংগঠন। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম অন্তর্হিত হয়। একটা বিশেষ অর্থে তখনই সেই প্রথম মানুষ অবশিষ্ট প্রাণীজগৎ থেকে চূড়ান্তভাবে তফাত হয়ে অস্তিত্বের নিতান্ত পাশবিক পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয় সত্যকার মানবিক পরিস্থিতিতে।

জীবনধারণের যে ক্ষেত্রটা মানুষকে ঘিরে আছে এবং এযাবৎ তার ওপর আধিপত্য করেছে সেই সমগ্র ক্ষেত্রটা এখন মানুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে–এই প্রথম মানুষ হয়ে ওঠে প্রকৃতির সত্যকার সচেতন প্রভু এই কারণে যে স্বীয় সমাজ-সংগঠনের প্রভু সে হতে পারল। তারই নিজ সামাজিক ক্রিয়ার যে নিয়ম এতদিন প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অজ্ঞাতসারে তার সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর আধিপত্য করেছে, তা এখন ব্যবহৃত হবে পরিপূর্ণ বোধের সঙ্গে এবং সেই হেতু তার ওপর প্রভুত্ব করবে মানুষ। মানুষেরই নিজ যে সামাজিক সংগঠন এতদিন প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে চাপানো এক আবশ্যিকতা রূপে তার সম্মুখীন হয়েছে, সে সংগঠন এখন হয়ে দাঁড়ায় তারই স্বাধীন কর্মের ফল। যে বহির্ভূত বাস্তব শক্তিগুলি এতদিন ইতিহাসকে শাসন করেছে তা চলে আসে মানুষেরই নিয়ন্ত্রণের অধীনে। শুধু সেই সময় থেকেই ক্রমসচেতনভাবে মানুষই রচনা করবে তার স্বীয় ইতিহাস, কেবল সেই সময় থেকেই মানুষ যে সামাজিক কারণগুলিকে গতিদান করবে সেগুলি প্রধানত এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে তারই বাঞ্ছিত ফলপ্রসব করবে। এ হল আবশ্যিকতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে মানুষের উত্তরণ।

আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষেপ রূপরেখার সারসংকলন করা যাক। ১। মধ্যযুগীয় সমাজ : ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিগত উৎপাদন। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী; সেই হেতু আদিম, অশোভন, নগণ্য, ক্রিয়া তাদের খর্বিত। হয় স্বয়ং উৎপাদক, নয় তার সামন্ত প্রভুর আশু ভোগের জন্য উৎপাদন। এই ভোগের ওপর যদি কখনো একটা উদ্বৃত্তি ঘটে কেবল তখনই সে উদ্বৃত্তিটা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়, বিনিময়ের মধ্যে আসে। সুতরাং পণ্যের উৎপাদন নিতান্ত তার শৈশবে। তবু তখনই তার মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় নিহিত সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য।

২। পুঁজিবাদী বিপ্লব : প্রথমে সরল সমবায় ও কারখানার সাহায্যে শিল্পের রূপান্তর। এযাবৎ বিচ্ছিন্ন উৎপাদন উপায়গুলির বড়ো বড়ো কারখানার মধ্যে কেন্দ্রীভবন। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপাদন উপায়ে তাদের রূপান্তর–এ রূপান্তরে বিনিময়ের ধরন মোটের ওপর অপ্রভাবিত। দখলের পূর্বতন ধরনগুলিই বহাল। পুঁজিপতির উদয়। উৎপাদন উপায়ের মালিক হিসাবে সে উৎপন্নকেও দখল করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে পণ্যে। উৎপাদন হয়ে দাঁড়ায় একটা সামাজিক কাজ। বিনিময় ও দখল থেকেই যায় ব্যক্তিগত কাজ, এক একটা ব্যক্তির ব্যাপার। সামাজিক উৎপন্ন দখল করে ব্যক্তি পুঁজিপতি। মৌলিক বিরোধ, তা থেকে অন্য সবকিছু বিরোধের উদয়, যার মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের সমাজ এবং আধুনিক শিল্প যা উদ্ঘাটিত করেছে।

ক। উৎপাদনের উপায় থেকে উৎপাদকের বিচ্ছেদ। শ্রমিকদের জন্য আজীবন মজুরি শ্রমের ব্যবস্থা। প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে বৈরিতা।

খ। পণ্য উৎপাদন যে নিয়মগুলির অধীন সেগুলির বর্ধমান আধিপত্য ও ক্রমাধিক কার্যকারিতা। বেপরোয়া প্রতিযোগিতা। এক একটা ফ্যাক্টরিতে সমাজীকৃত সংগঠন এবং সামগ্রিক উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে বিরোধ।

গ। একদিকে, প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিগত কলওয়ালার পক্ষে যা বাধ্যতামূলক, যন্ত্রের সেই ক্রমোন্নতি এবং তার অনুপূরক হিসাবে শ্রমিকদের নিয়ত বর্ধমান কর্মচ্যুতি। শিল্পের মজুত বাহিনী। অন্যদিকে, এটাও প্রতিযোগিতার ফলে–প্রতিটি কলওয়ালার পক্ষে বাধ্যতামূলক উৎপাদনের সীমাহীন প্রসার। দুদিকেই উৎপাদনশক্তির অশ্রুতপূর্ব বিকাশ, চাহিদার তুলনায় যোগানের আধিক্য, অতিউৎপাদন, বাজার ঠাসা, প্রতি দশ বছর অন্তর সংকট, পাপ চক্র : এদিকে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের আধিক্য–ওদিকে কর্মহীন ও জীবিকাহীন শ্রমিকদের আধিক্য। কিন্তু উৎপাদন ও সামাজিক সমৃদ্ধির এই দুইটি কারিকা একত্রে সক্রিয় হতে অক্ষম কারণ উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি উৎপাদন-শক্তিকে আটকে রাখে কাজ থেকে এবং উৎপন্নকে আটকে রাখে সঞ্চালন থেকে–যদি না তারা প্রথমে পরিণত হয় পুঁজিতে কিন্তু এই অতি আধিক্যেই তা অসম্ভব। এ বিরোধ বেড়ে ওঠে এক অদ্ভুত স্তরে। বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উৎপাদন-পদ্ধতি। নিজেদেরই সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে আর পরিচালনা করতে অসামর্থের দ্বারা বুর্জোয়ারা অভিযুক্ত।

ঘ। উৎপাদনশক্তির সামাজিক চরিত্রের আংশিক স্বীকৃতি দিতে পুঁজিপতিরা নিজেরাই বাধ্য হয়। উৎপাদন ও যোগাযোগের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাতে নেয় প্রথমে জয়েন্টস্টক কোম্পানি, পরে ট্রাস্ট, অতঃপর রাষ্ট্র। অনাবশ্যক শ্রেণি রূপে প্রমাণিত হয় বুর্জোয়ারা। তাদের সামাজিক ক্রিয়ার সবই এখন চলে বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা।

৩। প্রলেতারীয় বিপ্লব : বিরোধসমূহের সমাধান। সামাজিক ক্ষমতা দখল করে প্রলেতারিয়েত তার দ্বারা বুর্জোয়ার হাত থেকে স্খলিত সামাজিকৃত উৎপাদন উপায়গুলিকে পরিণত করে সাধারণ সম্পত্তিতে। এ কাজের ফলে উৎপাদনের উপায়গুলি এতদিন যে পুঁজিরূপ চরিত্র ধারণ করেছিল তা থেকে প্রলেতারিয়েত তাদের মুক্ত করে তাদের সামাজিকৃত চরিত্রটার পরিপূর্ণ কাজ করে যাবার স্বাধীনতা এনে দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনায় সামাজিকৃত উৎপাদন এখন থেকে সম্ভব হয়। উৎপাদনের বিকাশের ফলে তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব কাল-ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে যে পরিমাণে নৈরাজ্য অন্তর্ধান করতে থাকে সেই পরিমাণে মরে যেতে থাকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। মানুষ অবশেষে নিজেরই সমাজ-সংগঠনের প্রভু হবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির প্রভু, নিজের প্রভু-মুক্ত।

সর্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত। ঐতিহাসিক অবস্থানটিকে পুরোপুরি বোঝা এবং সে কারণে এই কর্মের চরিত্র প্রণিধান করা, যে স্মরণীয় কীর্তি প্রলেতারিতের সাধন করার কথা তার অবস্থা ও তাৎপর্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করা আজকের নিপীড়িত প্রলেতারীয় শ্রেণিকে, এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক যে প্রকাশ সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।